



## **Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

**A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture**

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 76 - 89

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

# ঈশ্বর পাটনী : তুলনামূলক অধ্যয়নের আলোকে

কিশোরী মণ্ডল

গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: [kishorimondal30@gmail.com](mailto:kishorimondal30@gmail.com)



**Received Date 20. 01. 2026**

**Selection Date 10. 02. 2026**

### **Keyword**

*Ishwari Patni, Bharatchandra Raygunakor, Ishwar Patni, Chitta Sinha, newly created narrative, overall form, Bengali character, character reconstruction, working class, life's sorrows.*

### **Abstract**

*Ishwari Patni is a name eternally familiar to all Bengalis. In the poetry 'Annadamangal' (1752) by the renowned 18th-century poet Bharatchandra Raygunakor (1712-1760), this character represented the morality, nature, and glory of Bengalis throughout the entire medieval period. This Bengali character gradually transcended the boundaries of time, place, and circumstance to become a national character. The first mention of the character of Ishwari Patni is found in the last chapter of the first part of the poetry, known as 'Annapurna mangal' – specifically in the section titled 'Annadar Bhavananda Yatra.' With this, the character of Ishwari Patni became open to writers and readers alike in the vast expanse of literature. The portrayal of Ishwari Patni that we find in Bharatchandra's Annada mangal is confined to a small section of the poetry, yet its depth of meaning is boundless. How many truly understand the extent of sorrow, suffering, and the story of life's gains and losses behind Ishwari Patni's character? To uncover the vast scope hidden within Bharatchandra's Ishwari Patni character, centered around the boatman's life, one must turn to the discussion of Chitta Sinha's new creation, the novel 'Ishwar Patni'. Just as there was lamentation and suffering for food during the Turkish invasion, so too was there lamentation and suffering for food even after independence. Chitta Sinha, in his novel 'Ishwar Patni', has created a new narrative based on the character of Ishwari Patni from 'Annadamangal'. This is an example of how one history can exist within another. Creating such a profound narrative based on a seemingly insignificant character in a small part of the entire 'Annadamangal' poetry can be considered writing history within history. There might be ambiguity regarding whether the boatman character described in the literature is male or female. However, the modern fiction writer Chitta Sinha has clarified this ambiguity in his novel 'Ishwar Patni'. Here, he portrays the Ishwari Patni character from the 'Annada mangal' epic as a male character, but uses the name 'Ishwar Patni' instead of 'Ishwari Patni'. Just as an artist establishes an art form with their magical touch on the structure of a figure, so too did the literary mind of Chitta Singh give a holistic form to Ishwari Patni from Bharatchandra's poetry 'Annada mangal'. In Bharatchandra's narrative,*

'Ishwari Patni', the representative of the divinely afflicted poor Bengali people, yearns for a little milk and rice for her children. In contrast, Chitta Singh's 'Ishwar Patni' embodies the complete story of the struggle in the overall life of the impoverished working class. It depicts a life where one must constantly struggle to survive. The character of 'Ishwar Patni' is the protagonist of this life struggle. Chitta Sinha's 'Ishwar Patni' character is a new interpretation of Bharatchandra's 'Ishwari Patni'. Chitta Sinha has extended the essence of this character through the creative power of his own writing. Both Bharatchandra's 'Ishwari Patni' and Chitta Sinha's 'Ishwar Patni' characters shared the profession of ferrying people across the river; that is, they were boatmen. Their main source of income and livelihood depended on this river-based profession. Chitta Sinha has expanded the story of his novel based solely on the conversation between 'Ishwari Patni' and the goddess in the 'Annadamangal' poetry. The story of 'Ishwari Patni' from 'Annada mangal' is sequentially arranged in Chitta Sinha's novel. The novelist has given a new form to an apparently insignificant character created by Bharatchandra, infusing it with his own creative imagination. Chitta Sinha's 'Ishwar Patni' novel is a newly constructed narrative. Through the comprehensive description of the life of the 'Ishwar Patni' character in his novel, Chitta Sinha reveals to the reader the hidden story of suffering and hardship. To portray this complete life, he has divided the narrative into six chapters in the first part and five chapters in the second part. In the context of creating the novel 'Ishwar Patni', author Chitta Sinha has acknowledged his debt to Bharatchandra. Nevertheless, after reading the entire article, readers will have no difficulty understanding that through additions, omissions, and modifications to the original story of the 'Annadamangal' poetry, he has created a newly constructed narrative and reimagined the characters in a way that transcends the boundaries of time and remains highly relevant to readers. However, whether it is 'Ishwari Patni' or 'Ishwar Patni,' the skillful manner in which both authors portrayed the character as a representative of the poor, hardworking, and laboring people of Bengal, thereby shaping a national character, is undoubtedly commendable. Therefore, This article is driven by the urge to find a profound connection between the narrative of 'Ishwar Patni' by the modern fiction writer Chitta Sinha and the narrative of 'Ishwari Patni' from Bharatchandra's 'Annadamangal' poetry of the medieval period.

## Discussion

ঈশ্বরী পাটনী আপামর বাঙালির কাছে চিরপরিচিত একটি নাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে চরিত্রটি সমগ্র মধ্যযুগে বাঙালির নীতি-নৈতিকতা, স্বভাব ও গৌরবকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। বাঙালির এই চরিত্রটি ধীরে ধীরে স্থান-কাল-পাত্রের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় চরিত্রে আখ্যায়িত হয়েছিল। তিনটি খণ্ডে বিভক্ত 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' নামে পরিচিত কাব্যের প্রথম খন্ড 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২) কাব্যের শেষ পরিচ্ছেদে 'অন্নদার ভবানন্দ যাত্রা'র ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সাথে সাথে ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রটি সাহিত্যের খোলা আকাশে সাহিত্যিকদের ও পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ঈশ্বরী পাটনী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণা মর্ত্যধামে স্থায়ী পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে অভিশাপগ্রস্ত কুবের অনুচর বসুন্ধরের মর্ত সংস্করণ হরিহরের গৃহে দেবী গেলেন কিন্তু শেষপর্যন্ত হরিহরের গৃহে তিষ্ঠিতে না পেরে গঙ্গা পার হয়ে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহে যাইবেন বলে মনস্থির করলেন। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে দেবী গঙ্গা তীরে এসে উপস্থিত হলেন, সেখানে নদী পারাপার করে থাকে ঈশ্বরী পাটনী। দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীকে আদেশ করে গঙ্গা নদী পার করে দেওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় একাকিনী এক

অচেনা কুলবধূকে পার করে দিতে প্রথমে রাজি না হলেও শেষ পর্যন্ত তাকে গঙ্গা পার করে দিয়েছিলেন ঈশ্বরী পাটনী। যদিও গঙ্গা পার করার পূর্বে পাটনী দেবীর পরিচয় জানতে চেয়েছিলে। দেবী অন্নপূর্ণাকে দ্ব্যর্থ ভাষায় পরিচয় দিলে সহজ সরল গ্রাম্য মানুষের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অতঃপর দেবীকে গঙ্গা পার করার সময় দেবীর পা দুখানি সঁউতির উপরে রাখতে বলে ঈশ্বরী পাটনী, কারণ গঙ্গায় কুমিরে তার পা-দুখানি কেটে নিয়ে যেতে পারে। এখানে যাত্রী নিরাপত্তার পাশাপাশি একজন পিতা তার সন্তানের প্রতি যে কর্তব্য বা স্নেহের প্রয়োজন থাকে তার একটা প্রচ্ছন্ন ছবি আমরা দেখতে পাই পাটনীর চরিত্রে। তার পা-দুখানি কাঠের সঁউতির উপরে রাখলে সঁউতিটি সোনা হয়ে যায়। সোনার সঁউতি দেখে পাটনী ভীত ও অবাক হয়ে উচ্চারণ করলেন -

“এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।”<sup>১</sup>

তবে দেবীর পায়ের স্পর্শে কাঠের সঁউতি সোনা হয়ে গিয়েছিল কিনা বলা কঠিন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরী পাটনীর কাঠের তরী যে সোনার চেয়েও মূল্যবান হয়ে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। দেবী তীরে নেমে যখন চলতে লাগলেন তখন পিছনে পিছনে পাটনীও চলতে লাগলেন। দেবী যখন পিছনে ফিরলেন তখন দেখেন পাটনীর চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ। পাটনী হাতজোড় করে বললেন, আপনার ছল আমি বুঝিনি। এই জপতপহীন মূর্খ পাটনী কেমন করে বুঝবে? দেবী তখন তার পরিচয় ব্যক্ত করলেন এবং তাকে বর নিতে বললেন। সেই মুহূর্তে ঈশ্বরী পাটনীর মুখ দিয়ে ভারতচন্দ্র শতাব্দীর সেরা বাঙালির আবেদনকে পাঠকের সামনে তুলে আনলেন—

“প্রণমিয়া পাটনী কহিছে ঘোড় হাতে।

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।।”<sup>২</sup>

পাটনী চাইলেই অনেক কিছুই চেয়ে নিতে পারত। কালকেতু এই দেবীর কাছ থেকে একুশ ঘোড়া সোনার মোহর পেয়েছে, রাজা হয়েছে আর সেখানেই হয়তো কালকেতু তার নিজের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। এই কাব্যে হরিহরও ধন-সম্পদের পরিবর্তে জগৎ জননীর চরণপ্রিয় প্রার্থনা করেছে। হয়তো সে নিজের মোক্ষলাভের কথা মাথায় রেখেই এই প্রার্থনা করেছিল কিন্তু ঈশ্বরী পাটনী নিঃস্বার্থ মনে তার সন্তানের সুখ চেয়েছে বংশ-পরম্পরায়। পিতা-মাতা তার সন্তানের সুখের জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠিত হন না, তাই আমরা পাটনী চরিত্রেও দেখলাম সে নিজের জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা না ভেবে তার সন্তানের সুখ চায়। তার সন্তানেরা যেন অনাহারে দিনপাত না করে আর এখানেই হয়তো ঈশ্বরী পাটনী তার জীবনে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ খুঁজে পেয়েছে। পাটনী তার নিজস্ব মানব গুণে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। ঈশ্বরী পাটনী দৈবপীড়িত দরিদ্র বাঙালির প্রতিনিধি। উপরে যেটি আলোচনা করা হল ‘অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা’ অংশে ঈশ্বরী পাটনী সংক্রান্ত বিষয়টি ছিল অনেকটা এরকম।

‘অন্নদামঙ্গল’ - এর ঈশ্বরী পাটনী ছিল একজন মাঝি। নদীতে খেয়া পারাপার করে যে সামান্য অর্থ উপার্জন হয় তাতেই তাকে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে হয়। তাকে বাঁচতে গেলে জীবনে নানা সংকটের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়। সে খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। খেয়া পারাপার করাই তার পেশা। এই পেশাটি সমাজের মানুষের কাছে অতি নিম্নমানের। ঈশ্বরী পাটনী চরিত্র নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সাহিত্যিকদের মধ্যে বিরাট কোলাহল ও সমালোচনা হয়েছিল। তবে ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রকে সাহিত্যের রূপ দিয়েছিল এমন সাহিত্যিকদের সংখ্যা খুবই কম। অবশ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) দুটি চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছিলেন। একটি ‘অন্নপূর্ণা বাঁপি’ অন্যটি ‘ঈশ্বরী পাটনী’। ফ্রান্সের ‘ভরসেলস নগরে’ থাকাকালে চতুর্দশপদী লিখে মুগ্ধ হয়ে মধুসূদন ঈশ্বরী পাটনীর সম্পর্কে বলেন -

“মায়ের ঐ রাজা পায়ের বর্ণনা আমি যদি করতে পেতাম, তাহলে আরও কত সুন্দর হতো তা!”<sup>৩</sup>

আমরা ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ঈশ্বরী পাটনীর যে পরিচয় পেয়েছি তা কাব্যের মাত্র ছোটো একটা পরিসরে, কিন্তু তার ভাবগভীরতা দিগন্ত বিস্তৃত। ঈশ্বরী পাটনীর চরিত্রের পিছনে তার জীবনের দুঃখ, যন্ত্রণা ও তার জীবনের পাওয়া না পাওয়ার গল্প কতটা আছে তা আর কতজন উপলব্ধি করে থাকেন!

ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী চরিত্রের মধ্যে যে একটি বৃহৎ পরিসর লুকিয়ে আছে পাটনীর জীবনকে কেন্দ্র করে তা খোঁজ পেতে গেলে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক চিত্ত সিংহের নবনির্মিত আখ্যান *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসের আলোচনায়

আসতে হবে। তুর্কি আক্রমণের ফলে অল্পের জন্য যেমন একদিকে হাহাকার ও জীবনবেদনা তেমনি স্বাধীনতার পরেও অল্পের জন্যেও যে হাহাকার ও জীবনবেদনা তা চিত্র সিংহ তার *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসে *অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বরী* পাটনীর সূত্রধরে নতুন ভাষ্য সৃষ্টি করেছেন। ইতিহাসের মধ্যেও যে আর এক ইতিহাস থাকতে পারে এটি তারই উদাহরণ। পুরো *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ছোটো একটা অংশে এরকম সামান্য একটি চরিত্রকে নিয়ে নিজের ভাব গভীরতায় এরকম একটা আখ্যান সৃষ্টি তা ইতিহাসের মধ্যে ইতিহাস রচনা করা বলা যায়। ভারতচন্দ্রের *ঈশ্বরী* পাটনী চরিত্রকে কেন্দ্র করে চিত্র সিংহ তাঁর উপন্যাসকে সজ্জিত করেছেন এবং পরিপূর্ণতা দান করেছেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে *ঈশ্বরী* পাটনীর চরিত্রটি ছিল প্রচ্ছন্ন রূপে তাকে পরিপূর্ণভাবে জানতে ও বুঝতে পাঠকের কোথাও মনে অস্পষ্ট থাকতে পারত, কিন্তু চিত্র সিংহ তার *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসে সেই অস্পষ্টতার রূপ ভেদ করে *ঈশ্বরী* পাটনীর চরিত্রকে দিয়েছে সামগ্রিক রূপ। ঠিক যেমন একটি মানুষের জন্মগ্রহণ করার পর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর যে ধারাবাহিক জীবন এই উপন্যাস তারই এক বাস্তব উদাহরণ *ঈশ্বর পাটনীর* চরিত্রকে নির্ভর করে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ‘*ঈশ্বরী পাটনী*’ চিত্র সিংহের কাছে হয়ে উঠেছেন ‘*ঈশ্বর পাটনী*’। চিত্র সিংহ এই *ঈশ্বর পাটনীর* সমগ্র জীবনের বর্ণনা দিয়েছেন এই উপন্যাসে, যেটা *অন্নদামঙ্গল* কাব্য সম্পূর্ণ ছিল না। সেখানে ছিল তার কর্মজীবন আর চিত্র সিংহ এই পাটনী চরিত্রের কর্মজীবনের সহিত সাংসারিক জীবনসহ পূর্ববর্তী জীবনের অনুসন্ধানের ব্যাখ্যা দিয়ে একটা সামগ্রিক রূপ দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি *ঈশ্বরী* পাটনীর চরিত্রের পুনর্নির্মাণ করলেন আধুনিক যুগের ঔপন্যাসিক চিত্র সিংহ। সাহিত্যে বর্ণিত পাটনী চরিত্রটি পুরুষ চরিত্র নাকি নারী চরিত্র তা নিয়ে দ্বিধা থাকতেই পারে। আশুতোষ ভট্টাচার্য *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের এই পাটনী চরিত্রকে ‘ডোম রমণী’ বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন অর্থাৎ নারী চরিত্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিককালে অধ্যাপিকা জয়িতা দত্ত পাটনী চরিত্রটি পুরুষ কিংবা নারী এই দ্বন্দ্ব যেতে রাজি নন। তবে আধুনিক কথা সাহিত্যিক চিত্র সিংহ তাঁর *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্ব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এখানে তিনি *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের *ঈশ্বরী* পাটনী চরিত্রটি পুরুষ চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন, তবে নাম দিয়েছেন ‘*ঈশ্বরী পাটনী*’র বদলে ‘*ঈশ্বর পাটনী*’। একজন শিল্পী যেমন অবয়ব কাঠামোতে তাঁর জাদু স্পর্শে শিল্পরূপ প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের *ঈশ্বরী* পাটনীকে সাহিত্যিক চিত্র সিংহ একটি সামগ্রিকতায় রূপ দিলেন। যেখানে একটি মানুষকে বেঁচে থাকতে গেলে নিয়ত জীবন সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকতে হয়। সেই জীবন সংগ্রামের কাভারী হলেন *ঈশ্বর পাটনী* চরিত্র। চিত্র সিংহের *ঈশ্বর পাটনীর* চরিত্র ভারতচন্দ্রের *ঈশ্বরী* পাটনী চরিত্রের নতুন রূপ, সেই চরিত্রের স্বরূপকেই এখানে দীর্ঘায়িত করেছেন চিত্র সিংহ তাঁর নিজস্ব লেখনীর সৃজন ক্ষমতায়। ভারতচন্দ্রের *ঈশ্বরী* পাটনী ও চিত্র সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* চরিত্রের দুজনের পেশা ছিল খেয়া পারাপার করা অর্থাৎ মাঝি। দুজনের অর্থ উপার্জন ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে নদীমাতৃক পেশাই ছিল মূল অবলম্বন। চিত্র সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসটি প্রথম মুদ্রিত ১৯৭৬ সালের অক্টোবর মাসে। কলকাতার সৃজনী প্রকাশনী থেকে প্রকাশ হয়েছিল। সৃজনী প্রকাশনীর পক্ষ থেকে বইয়ের সূচনাতে প্রকাশন বিবৃতির অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

“মাত্রা মেনে অতিরঞ্জন ও স্বল্পরঞ্জন দুই-ই সৎ-সাহিত্যের বিষয়ীভূত। এবং আদ্যন্ত গূঢ় রহস্যময়তা মহৎ সাহিত্যের একটি অত্যাবশ্যিকীয় শর্ত। ‘*ঈশ্বর পাটনী*’-তে চিত্র সিংহ অবলীলায় সেই লৌকিকে-অলৌকিকে চিন্ময় রহস্যময়তাকে বড় মমতায় নাড়াচাড়া করেছেন। প্রমাণ করেছেন, সৎ-সাহিত্য বিষয় নির্ভর নয়, গূঢ়-গভীর ভাবনা নির্ভর।”<sup>৪</sup>

অন্যদিকে *ঈশ্বর পাটনী* সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের নিজস্ব মন্তব্য, -

“*ঈশ্বর পাটনী*’র কাহিনী সূত্রের জন্য আমি কবিশ্রেষ্ঠ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাছে ঋণী। চরিত্রের প্রয়োজনে তাঁর অসামান্য পদসমূহের সামান্য পরিবর্ত নিশ্চয়ই সহৃদয় পাঠক পাঠিকার ক্ষমা পাবে।”<sup>৫</sup>

সহজেই বোঝা যায় ‘অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা’র মূল কাহিনীর সূত্র ধরে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে ঔপন্যাসিক নতুন আখ্যান সৃষ্টি করলেন। মঙ্গলকাব্যের চরিত্রকে পাথেয় করে চিত্র সিংহ যেমন সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তেমনি পৌরাণিক কাব্যের চরিত্র, কাহিনী, উপাদান ও আঙ্গিক প্রভৃতি নিয়ে অন্যান্য সাহিত্যিকরাও সাহিত্য নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেছেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) *নাগিনীকন্যার কাহিনী* (১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) ও *অরণ্যবহি* (১৩৭৩) উপন্যাসের স্ট্রীকচারে এসেছে মঙ্গলকাব্যের গল্প বলার ভঙ্গি। *নাগিনীকন্যার কাহিনী* মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর পুনর্নির্মাণ। চাঁদ

সওদাগার-লখিন্দর-বেহলা কাহিনী স্থান পেয়েছে উপন্যাসে। সমরেশ বসুর (১৯২৪-১৯৮৮) উত্তরঙ্গ (১৯৫১) উপন্যাসে বিদ্রোহী সিপাহী হীরালাল ওরফে লখিন্দরের কাহিনী নির্মাণে মনসামঙ্গলের উপাদান প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক। মঙ্গলকাব্যের উপাদান সমরেশ বসু তাঁর *সওদাগর* (১৯৫৬-৫৭) উপন্যাসেও প্রয়োগ করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০) তাঁর *অমাবস্যার গান* (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ) উপন্যাসটি কবি ভারতচন্দ্রের জীবনকথা অবলম্বনে রচনা করেছেন। মধ্যযুগের কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে ‘গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ’ ও ‘ব্যাধখন্ড’ (১৯৯৪) অবলম্বনে মহাশ্বেতা দেবী রচনা করেন *ব্যাধখন্ড* উপন্যাস। মুকুন্দ চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* অবলম্বনে তিনি *বেনেবউ* (১৯৯৪) উপন্যাসও লেখেন। এরকম অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়, তবে এসবের মধ্যেও চিত্ত সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসটি এক অভিনব সৃষ্টি তা পাঠ করলে সহজেই বোঝা যায়। ইতিহাসের মধ্যে যেমন ইতিহাস লুকিয়ে থাকে, তেমনি *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এক অপ্রধান চরিত্রের উপর নির্ভর করে পূর্ণাঙ্গ একটা উপন্যাসে রূপ দেওয়া তা তো অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। একটি অপ্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করেই গোটা একটা উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ যেকোনো স্রষ্টাকে অসাধারণ করে তোলে। কোনো স্রষ্টা যখন কিছু সৃষ্টি করেন তখন তাঁরা বিন্দুতে সিন্দুর দর্শন করাতে পারেন, সাধারণ মানুষের চোখে আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ বিষয়কে স্রষ্টার নিজের প্রতিভার বলে অসাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, তেমনি মঙ্গলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের একদম শেষের দিকে উল্লিখিত ছোট্ট একটা অংশের মধ্যে একটি অপ্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে সামান্য বদল ঘটিয়ে একটি সামগ্রিক রূপ দেওয়া *ঈশ্বর পাটনী* আখ্যানটি বিন্দুতে সিন্দুর দর্শন ও অসাধারণত্বতে উত্তীর্ণ করার মতো বজ্রকঠিন কাজকে চিত্ত সিংহ সম্পন্ন করেছেন। একজন স্রষ্টা কোনো সামান্য বিষয়কে নিজের কল্পনার বাক বিস্তারে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ শিল্প রূপায়ণের চেষ্টা করেন, তেমনি এক্ষেত্রে চিত্ত সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই কথাটি বলা সম্ভব। চিত্ত সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* পুরো বিষয়টা যেন *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের *ঈশ্বরী* পাটনীর ঘটনা পরপর লিপিবদ্ধ করা। *অন্নদামঙ্গল* কাব্য আখ্যান তাই সেই পরিসরে কবির বর্ণনায় সব বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। সেই বিষয়টা মাথায় রেখেই *ঈশ্বর পাটনী* চরিত্রের অতীতের কোনো জীবনকাহিনী থাকতে পারে সেইরকম একটা কল্পনাবিস্তার করে এবং সেই উপন্যাসে নিজস্ব চিন্তাভাবনার উপর নির্ভর সার্থক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে ছয়টি অধ্যায় ও দ্বিতীয় পর্বে পাঁচটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম পর্বের অধ্যায়গুলিতে ঔপন্যাসিক *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মূল কাহিনীর উপর নির্ভর করে নিজের চিন্তাভাবনার রংয়ের মাধুরী মিশিয়ে সাহিত্যে রাঙিয়েছেন। অপরদিকে দ্বিতীয় পর্বে *অন্নদামঙ্গল*ের ‘অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা’র মূল বিষয়বস্তুর ও কাহিনীর সঙ্গে বহুলাংশে মিল রেখেই তিনি এগিয়েছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মূল কাহিনী আর প্রথম অধ্যায়ে মূল কাহিনীর সূত্র ধরে কি কি ঘটতে পারে তাঁরই বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজস্ব চিন্তাভাবনার স্বাক্ষর রেখেছেন ঔপন্যাসিক। *অন্নদামঙ্গল*ের *ঈশ্বর পাটনী*র অসম্পূর্ণ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছেন চিত্ত সিংহ। উপন্যাসের বেশিরভাগ চরিত্রের নামকরণে পৌরাণিক দেবদেবীর নামকে আশ্রয় করার পাশাপাশি গ্রাম্য সংস্কৃতিতে খেটে খাওয়া মানুষের মুখের ভাষা ব্যবহার লক্ষ্যণীয়।

“শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ  
 পথে পথে।”<sup>৬</sup>

প্রথম পর্বে শুরুতে এই গানটির অর্থ যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে প্রথম পর্বের ছয়টি অধ্যায়ের মধ্যে। গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) রচিত ‘গীতবিতান’এ পূজার ৪০০তম গান। গানের মধ্যেই অনুমান করা যায় যে, তাঁর পরম পূজ্য দেবতার কাছে যিনি মুক্তি দিতে পারেন তার কাছে তার দুঃখের ও অর্থকষ্টের কথা জানাচ্ছেন, তবে পরের পংক্তি সহ যদি ‘গীতবিতান’ এর গানটি উল্লেখ করা যায় অনেকটা স্পষ্ট হবে -

“শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে ফিরি হে দ্বারে দ্বারে  
 চিরভিখারীর হৃদি মম নিশিদিন চাহে করে।”<sup>৭</sup>

চিত্ত সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র *ঈশ্বর পাটনী*। *ঈশ্বর পাটনী*র জীবনে দারিদ্র্য ও অর্থ কষ্টের সীমা অসীম আর পুরো উপন্যাস জুড়েই সেই আখ্যান আলোচিত। উপন্যাসে *ঈশ্বর পাটনী*র দারিদ্র্যের মধ্যে অর্থকষ্টে বেঁচে থাকার

জীবন সংগ্রামের কাহিনী বিধৃত হয়েছে। প্রথম পর্বে দরিদ্র জীবনের কথা তুলে ধরেছেন আর দ্বিতীয় পর্বে দরিদ্র জীবন থেকে বেঁচে থাকার আশায় তিনি স্বপ্নের জগতে বিচরণ করেছেন। দুটি পর্বের শুরুতেই দুটি বিখ্যাত মানুষের গান ব্যবহার করেছেন। অবশ্যই উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখেই। প্রথম পর্বের উল্লিখিত গানের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর দ্বিতীয় পর্বের গানের স্রষ্টা অতুলপ্রসাদ সেন (১৮৭১-১৯৩৪)। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে -

“আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা  
আমি যে পথে চিনি না।”<sup>৮</sup>

প্রথম পর্বের গানে যে অর্থকষ্টের প্রসঙ্গ সেখানে দ্বিতীয় পর্বের গানে সখার হাত ধরে নতুন জীবনের পথে যেতে চাইছেন। ‘সখা’ হচ্ছে ঈশ্বরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তা উপন্যাস আলোচনা করলে সহজেই বোঝা যাবে। দুটি পর্বের শুরুতে যে দুটি গান ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক, তা দুটি পর্বের বিষয়ের সঙ্গে তার অর্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা কথাসাহিত্যিকের নিজের মজবুত হাতে গড়া। দুটি পর্বের ঈশ্বরের দুঃখের কাহিনী ও জীবনের সংগ্রাম ফুটে উঠেছে। প্রথম পর্বের ছটি অধ্যায়ে ঈশ্বরের জীবনের কাহিনী ও সুখ-দুঃখের কাহিনী ক্রমান্বয়ে বর্ণনা করা হয়েছে তবে দ্বিতীয় পর্বের পাঁচটি অধ্যায়ে ঔপন্যাসিকের ব্যবহারের দৃষ্টিকোণের কৌশল ভিন্ন, সেখানে তিনি পরিব্রাজকের উপায় খোঁজার মধ্য দিয়ে জীবনে দুঃখ যন্ত্রণার এবং অর্থ কষ্টের কথা তুলে ধরেছেন। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যের ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর পেশা ছিল নদীতে খেয়া পারাপার করা অর্থাৎ নদীকেন্দ্রিক জীবিকার উপর নির্ভর করেই তাঁর সংসার চলত এবং জীবনযাপনের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যেদিন ভালো পারানি পায় সেদিন তার ভালোভাবে চলে। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটনী ও দেবীর কথোপকথনের অংশের উপর নির্ভর করেই চিত্ত সিংহ তাঁর উপন্যাসের কাহিনী বিস্তার করেছেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনী চিত্ত সিংহের উপন্যাসে ক্রমান্বয়ে সাজানো। ভারতচন্দ্রের দ্বারা একটা আপাত তুচ্ছ চরিত্রের উপর নির্ভর করে ঔপন্যাসিক তার আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক নবরূপ দিয়েছেন। চিত্ত সিংহের *ঈশ্বর পাটনী* উপন্যাসটি একটি নবনির্মিত আখ্যান। নবনির্মিত আখ্যান সম্পর্কে প্রাবন্ধিক অরুণকুমার দাস ২০২৫ সালে এক ব্যক্তিগত মতবিনিময়ে লেখেন, -

“একজন লেখক নতুন করে আখ্যানকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়তে গিয়ে উপন্যাস লেখকরা চালিত হন নতুন কালের মূল্যবোধ ও চৈতন্যের দ্বারা। চিত্ত সিংহের উপন্যাস তো আমাদের এই নিপীড়িত মানুষের সম্পর্কে ভাবি কালের মূল্যবোধ ও চৈতন্যের দিককেই সচেতন করে। কাব্যিক উপাদানকে উপন্যাসের অবয়বে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিককে নিজের কল্পনার সঙ্গে মেশাতে হয়। মূল কাহিনী সঙ্গে সংযোজন, বর্জন ও পরিমার্জনের মধ্যে দিয়েই এক নতুন রূপ দিয়েছেন। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের কাহিনীতে ঈশ্বরী পাটনীর আবির্ভাব একেবারে খেয়া ঘাটে যখন দেবী অন্নপূর্ণার নদী পারাপারের প্রয়োজন পড়েছে। ভারতচন্দ্রের দেবী স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরির প্রয়োজন ছিল। সেক্ষেত্রে ঈশ্বরী পাটনীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া কবির অভিপ্রেত ছিল না।”<sup>৯</sup>

আবার, এভাবেও বলা যায় কাব্যিক উপাদানে সমস্ত কিছু গল্পের আখ্যানের আকারে বলাও সম্ভব নয়, তবে চিত্ত সিংহ সেই ঈশ্বরী পাটনীকে তাঁর উপন্যাসে সামগ্রিক জীবন বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর পাটনী চরিত্রটিকে পাঠকের কাছে লুকিয়ে থাকা দুঃখ যন্ত্রণা জীবনকথা তুলে ধরেছেন। সেই সামগ্রিক জীবনকে তুলে ধরতে প্রথম পর্বে ছয়টি অধ্যায় এবং দ্বিতীয় পর্বের পাঁচটি অধ্যায় বিভক্ত করেছেন। এবার, আধুনিক কথাসাহিত্যিক চিত্ত সিংহের ‘ঈশ্বর পাটনী’র আখ্যানের মূল আলোচনায় মধ্যে দিয়ে মধ্যযুগের ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ‘ঈশ্বরী পাটনী’র আখ্যানের একটি গভীর সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করব।

প্রথম পর্বের প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘ঈশ্বরের বংশ পরিচয়’। এখানে ঈশ্বর পাটনীর বংশের পরিচয় নামসহ পুত্র দেখানো হয়েছে যেখানে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে ঈশ্বরী পাটনীর বংশ পরিচয় তেমন কোন উল্লেখ ছিল না। এই অধ্যায়ে পিতৃপুরুষদের পরিচয়ের পাশাপাশি তাদের পেশা সম্পর্কেও আলোচিত হয়েছে। ঈশ্বর খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। গ্রাম্য, সহজ, সরল অশিক্ষিত ও চরম দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত এক দুঃখী মানুষ। চরম দারিদ্র্যতায় জীবন কাটালেও তার মন কখনো দরিদ্র ছিল না, কারণ দারিদ্র্যতার মধ্যে এক অশিক্ষিত পিতা তার বংশধরদের শিক্ষিত করার জন্য মনের অদম্য

ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার পুত্রের সদিচ্ছা না থাকার ফলে এবং ঈশ্বরের স্ত্রীর বুদ্ধি শুনে সে বাড়ি থেকে পালালো। এইরকম মানসিক উদ্যোগের আঘাতের পরে তিনি আর চেষ্টাই করেননি, বরং নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে -

“জাত পাটনীর ছেলে কি আর দিকগজ হবে?”<sup>১০</sup>

আবার, তার সন্তান পালানোর ক্ষোভে ও দুঃখে বলতে বাধ্য হয় -

“মন্দ কি! একপেট খোরাক বাঁচলো।”<sup>১১</sup>

এ যেন তার সন্তান হারানোর বেদনায় এক মনের সান্ত্বনা। বোঝাই যায় ঈশ্বরের দারিদ্র্য, দুঃখ ও মনের যন্ত্রণা। ঈশ্বরের একার রোজগারের উপর সমস্ত সংসারের দায়দায়িত্ব। অকুল সংসারে সাগরের উথালি পাথালি চেউয়ে এসে সে নাকানি চোবানি খায়। সে সংসার চালাতে হিমশিম ও নাজেহাল হয়ে পড়ে। ঈশ্বর দুঃখ ও যন্ত্রণার বলতে বাধ্য হয় -

“শালার সোমসারটাই ভিখিরী হয়ে গেছে যেন!”<sup>১২</sup>

ভোরের থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ঈশ্বরের কাজের বিরাম নেই। সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়িতে এসে যেটুকু সময় বসে সেটুকু সময়ও সে শান্তি খুঁজে পায় না। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঝামেলায় অতিষ্ঠ হয়ে জীবন-যন্ত্রণায় ঈশ্বর বলে ওঠে-

“মর, মর, গুষ্ঠীসুদু মর, জ্বালা জুড়োয়, হাড়ে বাতাস লাগে।”<sup>১৩</sup>

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম ‘পাটনীর স্ত্রী, পুত্র পরিবার ইত্যাদি’। এখানে ঈশ্বরের বৈবাহিক জীবন ও স্ত্রী, পুত্র পরিবার সম্পর্কে আখ্যান বিস্তৃত হয়েছে। ঈশ্বরের গোপ ওঠেনি সেই সময় ঈশ্বরের পিতা দূর গ্রামের পরমেশ্বরীর সাথে বিবাহ দেয়। পরমেশ্বরীর বিবাহ সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলেও, সে ছিল খুব তেজি। ঈশ্বরের সংসার জীবনও ছিল হতাশায় ভরা। স্ত্রীর কাছেও সে আশ্রয় ও শান্তি খুঁজে পায়নি। বিতৃষ্ণায় বলতে থাকে -

“থাক শালার বউ।”<sup>১৪</sup>

বউয়ের জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বর তার শান্তির স্থল খেয়াঘাটে চলে যায়, এই খেয়াঘাট ও নদীটি তার একমাত্র সঙ্গী হয়ে ওঠে। ঈশ্বরের সারাজীবনে বিরাট বড় একটা সময় নদী ও খেয়াঘাটেই কেটেছে। বাংলা সাহিত্যে নদীকে কেন্দ্র করে জীবন জীবিকা ও সংগ্রাম বহু উপন্যাসে আছে, উদাহরণস্বরূপ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *কালিন্দী* (১৯৪০), বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ইচ্ছামতী* (১৯৫০), অদ্বৈত মল্লবর্মনের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬), সমরেশ বসুর *গঙ্গা* (১৯৭৫) প্রভৃতি। ঈশ্বর পাটনী উপন্যাসে ঈশ্বরেরা ছিল তিন ভাইবোন। ঈশ্বরের নিজের আঠারো সন্তানের মধ্যে পাঁচটি সন্তান কোনোটা জন্ম হওয়ার সময় ও জন্মানোর পর মারা যায়, তবে তেরোটি সন্তান শেষমেষ বেঁচে ছিল। এই বিরাট বড় সংসারে সামান্য একচিলতে ভিটেটাই তাদের সম্বল। তেরোর মধ্যে সাতটা মেয়ে, বড় দুটো মেয়েকে বিয়ে দিলেও তাদের মধ্যে একজনের স্বামীর মৃত্যুর পর ঈশ্বরের কাছে চলে আসে। এ যেন রামপ্রসাদ সেনের (১৭১৮ বা ১৮৭২৩-১৭৭৫) আগমনী পর্যায়ের মায়ের ঘরে ফেরার মতো। তবুও ঈশ্বর তার দুর্দিনে নিজের সংকটে শঙ্করা কে আশ্রয় দিয়েছে। মুখে যতই বলুক মনে তার সন্তানের প্রতি অসীম দয়া ভালোবাসা রয়েছে। তিন নম্বর ভামিনী, সে পালিয়েছে এক রাখালের সঙ্গে এবং পরে সে বেবুশ্যে ও রঙ্গিনী হয়েছে। এই নিয়ে পাড়ার মানুষেরা ঈশ্বরের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে কেউ ভোলে না। অন্য মেয়েরা বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠলেও ঈশ্বরের সাধ থাকলেও তাদের বিয়ে দেওয়ার সাধ্য ছিল না। সংসারে ঈশ্বরের কষ্ট কেউ বোঝে না, সবাই তাঁকে দোষারোপ করতে থাকে। ঈশ্বরের আক্ষেপে-

“মাগো! এ-সোমসার বড় অবুঝ। এখানে, কেউ কারেও বোঝে না, বুঝতে চায় না।”<sup>১৫</sup>

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম ‘ঈশ্বরের বংশধরদের পেশা ও নেশা’। এখানে ঈশ্বরের জীবনধারণের জন্য তার পেশা ও তার ইচ্ছাকে তুলে ধরা হয়েছে। তার বড় আক্ষেপ কোন ছেলে যদি তাকে একটু সাহায্য করত, কেউ যদি তার বাবার পেশাকে বুঝে নিত। বড় ছেলে পালিয়েছে, দু নম্বরটা চুরি ছিনতাই ডাকাতি করে তিনবার কয়েদ খেটেছে তাই তার পয়সা নিতে ঈশ্বর ঘৃণা করে। এখানে ঈশ্বরের চরিত্রের মহিমা ফুটে ওঠে। একমাত্র চার নম্বর ছেলেটা ঈশ্বরকে একটু আশা দেখিয়েছিল। সে প্রতিদিন ঘাটে এসে বুড়ো বাপের খবর নিত। মাঝে মাঝে দাঁড় ধরা, বৈঠা যত্ন করা, সোঁউতি বেত দিয়ে কষে বাঁধা ও নৌকায় জল সেচার মতো সমস্ত কাজ করত। এটাই ছিল ঈশ্বরের এতদিনের স্বপ্ন যে, তার পৈতৃক পেশা কেউ একজন বুঝে নিক। তারপর সে যত্ন সহকারে তাকে নদীর রীতি নীতি বুঝিয়েছে, নৌকার ধাত শিখিয়েছে এবং শিখিয়েছে লোকের

কাছ থেকে কিভাবে পারানি নিতে হয়, কিন্তু আশা জাগিয়ে আবার আশা ভঙ্গ করে চলে যায় চার নম্বরটা। আবার ঈশ্বরের কাজ ঈশ্বরকেই বুঝে নিতে হয়, এভাবেই চলতে থাকে উপন্যাসের মধ্যে ঈশ্বরের জীবন সংগ্রাম। ঈশ্বর পিতা হয়েও তার সন্তানকে শাসন করতে পারে না, তাই যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে বলতে হয় -

“এ সংসারে কেউই তাকে ঠিক ঠিক বুঝল না। শালার বউ না, মেয়ে না, ছেলে না, কেউই নয়।”<sup>১৬</sup>

ঈশ্বরের স্ত্রী, সন্তান সবকিছু থেকেও সে নিঃস্ব, এর থেকে তার জীবনে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে একজন দুঃখী মানুষের জীবনে।

“বিশ্বসংসারে ঈশ্বর একেবারে একেলা।”<sup>১৭</sup>

নিয়ত তার নিজের সঙ্গে নিজের দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম। ঈশ্বর স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, তার ছেলেমেয়েদের মধ্যে কেউ যদি খেয়া পারাপারের দায়িত্ব বুঝে নিত তাহলে সে মহাজনের হাত ধরে গহনা নৌকা বানিয়ে বাণিজ্য করতে যেতে পারত। প্রসঙ্গত, শম্ভু মিত্রের (১৯১৫-১৯৯৭) ‘চাঁদ বণিকের পালা’র চাঁদ সওদাগরের কথা মনে পড়ে যায়। ঈশ্বরের আশা সে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে নাতিপুতি নিয়ে তার সুন্দর একটা সংসার হবে কিন্তু সেই স্বপ্ন তো বাস্তব থেকে অনেক দূরে। ঈশ্বরের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। সে কখনো গলায় দড়ি দিয়ে মরতেও চায় কিন্তু তাঁর সংসারের প্রতি দায়িত্ববোধ তার বিবেককে বাধা দেয়। ঈশ্বর কখনো নৌকার হাল ছেড়ে দিয়ে পালাতে চায় না, সেই দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতা ঈশ্বরের আছে। ঈশ্বর কখনো দায়িত্ব এড়িয়ে মুক্তি চায়নি। এখানে ‘নৌকার হাল’ আর ‘সংসারের বন্ধন’ দুটি শব্দ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এই বন্ধন ও দায়দায়িত্ব থেকে ঈশ্বরের মুক্তি নেই। ঈশ্বর সবাইকে সুখী করতে চেয়েছে কিন্তু দুনিয়াসুদ্ধ লোক ঈশ্বরকে দোষারোপ করে। তাই ঈশ্বর নিজের কর্মদোষ ও ভাগ্যদোষ মনে করে নিজের চোখের জলে একাকী বুক ভাসায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের নাম ‘ঈশ্বরের দিন’। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের সারাটা দিন কেমন ভাবে কাটে সেটাই আলোচিত হয়েছে। এখানে একটি খনার বচন ব্যবহার হয়েছে -

“ডাকে পাখি ছাড়ে না বাসা।”<sup>১৮</sup>

অর্থাৎ বোঝাই যায়, যখন ভোরের আলো স্পষ্ট হয় না তখন পাখি ডেকে ওঠে কিন্তু বাসা ছাড়তে পারে না আবছা অন্ধকার থাকার জন্য। সেরকম সময় উঠে ঈশ্বর তিন পো মাইল হেঁটে ঘাটে পৌঁছায় আর ফেরে মধ্যরাতে। তবে বেশিরভাগ সময় ঘাটেই সে রাত কাটায়, সারাদিন কেটে যায় খেয়া পারাপার করে এবং সোয়ারিদের কাছ থেকে পারানির কড়ি, কলাটা ও মুলোটা প্রভৃতি নিয়ে। এইভাবেই তার জীবিকা নির্ধারণ হয়। খরনদীর সঠিক রীতিনীতি না জানলে যেকোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। সাদা চুল দাড়ির জঙ্গলে ঈশ্বরের মুখ পরিপূর্ণ। রোদ্দুর, হিম, জল ও জঙ্গল উপেক্ষা করেই জীবনকে বাজি রেখেই সে এই খরনদীর বুক থেকে খেয়া পারাপার করে থাকে, কারণ এটাই তার জীবিকা অর্জনের একমাত্র উপায়। নদীতেই তার দিন যায় ও রাত যায়। ঘোলাজলের নদীটি ঈশ্বরের দ্বিতীয় সংসার, কারণ নিজের সংসার তার কাছে শ্মশান মনে হয়। নদীর তেজ, বাঁধ, ঝাল সব কিছুই ঈশ্বর বুঝতে পারে এবং যেন নদীটিও তার দুঃখ কষ্ট বোঝার সঙ্গী হয়ে উঠেছে। সারাদিন অনন্ত পারাপারে তার ক্লান্তি ও শ্রান্তি আসে না। কখন বেলা বাড়ে বেলা যায় সে বুঝতেই পারে না। দিনের আলো গেলেই ঈশ্বরের হুঁশ ফেরে যে -

“আরো একটি দিন গেল।”<sup>১৯</sup>

আর এই দিনটা সুখে গেল কি দুঃখে গেল সেটা নির্ভর করে পারানির অর্থের উপরে। যেদিন সে পারানি ভালো পায় সেদিন তার ভালোভাবেই কাটে আর যেদিন ঠিকমতো পারানি মেলে না সেদিন তার সংসারে কষ্টের সীমা থাকে না। পূর্বে উল্লেখ করা বাক্যের মধ্যেই ঈশ্বরের দুঃখ যন্ত্রণা সব কিছু লুকিয়ে আছে।

পঞ্চম অধ্যায় ‘ঈশ্বরের রাত্রি’। এখানে সারাদিন ক্লান্তির পরে যেদিন ঈশ্বরের মনে হয় সেদিন সে ঘরে ফেরে, নচেৎ বেশিরভাগ সময় রাত্রিযাপন করে খেয়া ঘাটে। এখানে ঈশ্বরের রাত্রি কেমন ভাবে অতিবাহিত হয় তার বর্ণনা আছে। ঈশ্বরের কাছে দিন-রাতের কোন পার্থক্য নেই। সোয়ারিদের দেওয়া বিড়ি খাওয়ারও তার সময় নেই। সরকারি নিয়মে সন্ধ্যা সাতটায় ফেরি বন্ধ কিন্তু মানুষের পারাপারের অন্ত নেই, তাই সারাদিন ক্লান্তির পরে রাতেও তার বিরাম ও বিশ্রাম নেই। ঈশ্বরও মানুষ, তার মনে দুঃখ, কষ্ট, ও যন্ত্রণা এগুলো উপলব্ধি হয়। তার মনও চায় যে, সারাদিন ক্লান্তির পরে রাতে একটু

প্রাণ ভরে ঘুমোতে ও পেট পুরে খেতে। তবে দুঃখের বিষয়, তার মনেই পড়ে না যে, সে কবে জীবনে পেট পুরে খেয়েছে। এরকম জীবনকষ্ট ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী যেকোনো পাঠককেই শিহরিত করবে। তাকে দু-প্রহর রাত্রি পর্যন্ত বসে থাকতে হয় সোয়ারিদের জন্য। তার রাত্রি কাটে গলুয়ে মাথা রেখে মড়ার মতো পরে থেকে। ঈশ্বর ভাবে তার মত নদীরও ক্লান্তি, শ্রান্তি ও বিশ্রাম নেই। দিনে রাতে নদীও অবিরাম বয়েই চলেছে। এখানেই দুজন যেন অভিন্ন হয়ে যায়। মানুষের জীবন তো নদীর মতই, নদীকে সে কখনো নারী হিসেবে আবার কখনো 'নাগরী' অর্থাৎ প্রেমিক হিসেবে বলতে কুণ্ঠিত নয়-

“ভরা শাওনে তোর রকম কি মাগী আমি কি চিনি নে?”<sup>২০</sup>

নদী যেন এখানে একটি চরিত্র। স্ত্রী ও সন্তানের চেয়ে নদী তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। নদীকে তার স্ত্রীর ও সংসার মনে হয়। নদীর ছুটে চলা দুধের ঢেউকে তার ছেলেমেয়ে মনে হয়। সবকিছু যেন নদীর সঙ্গে একাকার হয়ে যায় ঈশ্বরের জীবনে-

“শালার বাচ্চারা শুধু ভাসছে, ডুবছে, সাঁতরাচ্ছে।”<sup>২১</sup>

এসব ভাবতে ভাবতে ঈশ্বরের ঘুম ভেঙ্গে যায় ও বলে ওঠে -

“এও কী স্বপ্ন?”<sup>২২</sup>

নিজের সন্তানদের সে কোনোদিন নিজের মতো করে পায়নি, সেই যন্ত্রনা তার মনকে কুরে খায়। সেই যন্ত্রনা থেকে সে মুক্তির প্রত্যাশা করে স্বপ্নের মধ্যে অচৈতন্য অবস্থায়। তাই নদীর ঢেউকে তার সংসার ও সন্তান মনে হয়। তার জীবনে এরকম করুণ কাহিনী ঘেরা এই উপন্যাস।

ষষ্ঠ অধ্যায় ‘ঈশ্বরের অসুখ’। দিন-রাত্রি পরিশ্রমের ক্লান্তি ঈশ্বরের শরীর আর কতদিন সহবে। সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই অধ্যায়ে তার অসুস্থ হয়ে পড়া ও জীবন সম্পর্কে ঈশ্বরের নতুন ভাবনাবোধ তৈরি হয়। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের প্রতি স্ত্রীর অনুশোচনার সঙ্গে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। ঈশ্বর অসুস্থ হওয়ার পর সে জীবন থেকে মুক্তি চেয়েছে কিন্তু বন্ধু পরানের কথায় সে আবার উজ্জীবিত হয়ে বাঁচতে চায় -

“বাঁচন মানে কি জানিস, যা পাই নাই তার আশায় আশায় থাকা।”<sup>২৩</sup>

বন্ধু পরানও উত্তেজিত ভাবে জবাব দেয় -

“বাঁচন মানে কি জানিস, অচেনা রাস্তায় নিত্য নিত্য চরণ ফেলা, ফেলতে ফেলতে একদিন চলে যাওয়া।”<sup>২৪</sup>

ঔপন্যাসিক ঈশ্বর পাটনী ও পরানের মুখ দিয়ে জীবন সম্পর্কে পাঠককে নতুন করে যেন পাঠ দিলেন ও সচেতন করলেন। পুরো উপন্যাস জুড়ে ঈশ্বরের জীবনে একরকম ভাঙ্গা-গড়া রয়েছে। ঔপন্যাসিক ঈশ্বরের মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন সম্পর্কে পাঠ দিয়ে যান, সেরকম আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য -

“হ্যাঁগো নদী আছে বলেই না পারাপারের ঝামেলা?”<sup>২৫</sup>

এখানে ‘সংসার’কে ঔপন্যাসিক ‘নদীর’ সঙ্গে মিলিয়েছেন, আবার জীবনের দুঃখ-জ্বালা-ব্যথাকে নদী পারাপারের সঙ্গে মিলিয়েছেন। নদী থাকলে পাটনীকে পারাপারের ঝামেলা যেমন সহিতে হবে তেমনি জীবন থাকলে সংসারের দুঃখ-জ্বালা-ব্যথার জীবন যন্ত্রণাকেও মানুষকে সহ্য করতে হবে। তবে এখানেই প্রথম ঈশ্বরের প্রতি তার স্ত্রীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশে সে নতুন জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়। অসুস্থ ঈশ্বরকে খেয়া পারাপারের থেকে বিরত রাখার জন্য স্ত্রী নিজেই সোয়ারিদের সাথে প্রতিবাদ করে বলে ওঠে -

“মানুষ তো বটে। শরীল তো আর লোহায় গড়া নয়।”<sup>২৬</sup>

তা সত্ত্বেও ঈশ্বরকে আবার পা বাড়াতে হয় ঘাটের দিকে। ঈশ্বরের বয়স বাড়ে, সে এখন সংসারে সমস্ত দায়-দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিঃশর্ত ছুটি চায়। সে শুধু ঘুমোতে চায়, অনন্তকাল ধরে ঘুমোতে চায়। এভাবেই জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই প্রথম পর্ব শেষ হয়।

প্রথম পর্ব শুরু হবার সময় যেমন রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে শুরু হয়েছে, তেমনি দ্বিতীয় পর্ব শুরু হবার আগে অতুলপ্রসাদ সেনের এটি জনপ্রিয় গান দিয়ে শুরু হয়েছে, যেটা দ্বিতীয় পর্বের অধ্যায়গুলোর সঙ্গে তার অর্থ সম্পৃক্ত।

“আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা  
 আমি যে পথ চিনিনে।”<sup>২৭</sup>

প্রথম পর্বের জীবনের যে সংগ্রাম ও তার পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্বে সেই সংগ্রামে দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা এক স্বর্ণময় আবির্ভূত দেবীর কাছে বর্ণনার মধ্যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের চেষ্টা। দ্বিতীয় পর্বটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। এই পর্বের সঙ্গে অন্নদামঙ্গলের ‘অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা’র ঈশ্বরী পাটনীর কাহিনীর বহুল মিল আছে। সেই বিষয়ের উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় পর্বের অধ্যায়ের নাম দেওয়া এবং ক্রমান্বয়ে ঘটনা পরম্পরা বর্ণনা দেওয়া। সামান্য অদলবদল ঘটিয়ে প্রথম পর্বে কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঔপন্যাসিক তার অধ্যায়গুলি নিজস্ব কল্পনায় একটি মানানসই সামগ্রিক রূপ দিয়েছেন। মূলত দ্বিতীয় পর্বে ঈশ্বর পাটনীকে বেশিরভাগ সময় স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে দেখা যায়। স্বপ্ন দেখাটাই ঈশ্বরের মতো মানুষের একমাত্র সম্বল। উপন্যাসটি দুটি পর্বে বিভক্ত হলেও শিরোনামের ক্রমিক ঠিক রেখেছেন ঔপন্যাসিক।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম ‘এক কুয়াশানিবিড় চন্দ্রালোকে’। এই অধ্যায়ে ঈশ্বরকে এক কুয়াশানিবিড় চন্দ্রালোকে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে দেখা যায়। এখানে তার নিজের দারিদ্র্য ঘোঁচাতে সে একাদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ব্রত করে। কুয়াশানিবিড় চন্দ্রালোকে সে কাঠ পাতার ছাউনির নীচে আরামে না শুয়ে ঠান্ডায় গলুয়ের উপরে শুয়ে পড়ে, কারণ কখন কে পারানির জন্য ডাকবে। সহজ সরল গ্রাম্য সংস্কৃতিতে বড়ো হয়ে ওঠা বয়স্ক ঈশ্বরের কর্তব্য পরায়নতা যেকোনো মানুষকে মুগ্ধ করে দেয়। গলুয়ের উপরে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে, কোন এক নারী তাকে আত্মকণ্ঠে ‘মাঝি’ বলে ডাকছে নদী পার করে দেওয়ার জন্য। ডাক শুনে ঈশ্বরের মনে হয়েছিল, এই কণ্ঠ নিশ্চিত কোন যুবতীর, সম্ভবত কোনো ঘর পালানো কুমারী, বিধবা অথবা স্বামী-তাড়িত বধু। প্রথমে সে তার নিজের মেয়ে লক্ষ্মী বলে ভ্রম করলেও পরে সে এক অবয়বকে আবিষ্কার করে তার পরিচয় জানতে চাইলে সেই নারী বলে ওঠে -

“আমি গো, আমি।”<sup>২৮</sup>

তখন ঈশ্বরের মনে হয়, -

“যেন পাখি ডাকল।”<sup>২৯</sup>

উপন্যাসে ‘পাখি’ এই ব্যঞ্জনাত্মক শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। পাখির সাথে কখনো তার ঘুম ভেঙ্গে বাস্তবে ফিরে আসার কথা বোঝানো হয়েছে আবার কখনো ঈশ্বরের কাছে স্বপ্নের দূত। পাখিরূপী নারী হয়তো ঈশ্বরের কাছে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের অল্পপূর্ণা। এত রাতে নদী পারাপারের হুকুম নেই জানিয়ে দেওয়ার পরেও নারীটির আর্তনাদের কাছে ঈশ্বরের মন নতি স্বীকার করে। আসলে এই অধ্যায় থেকে *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সঙ্গে বিরাট সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে দেবীর আগমনের মুহূর্তটাই এই অধ্যায়ে চিত্ত সিংহ বর্ণনা করেছেন নিজের প্রতিভায়।

অষ্টম অধ্যায়ের নাম ‘যুবতীর রূপগতি গৃহবধু’। ঈশ্বর যখন ঘাটের কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি বুঝলেন নারীটি যুবতী, রূপবতী ও গৃহবধু। ঈশ্বর গৃহবধুটির সামনে কাঠের গুড়ির ওপর বসে সম্পূর্ণ পরিচয়ের মাধ্যমে তার গৃহ ছেড়ে পালানোর কারণ জানতে চায়। ঈশ্বর জানে এত রাতে গৃহস্থ পরিবারের বধুকে পার করলে পরে সে বিপদে পড়তে পারে। পুলিশের ঝামেলা ও উটকো ঝামেলায় ঈশ্বর যেতে চায় না। তাই সে বধুটির পরিচয় জানতে চায় যেটা *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের ঈশ্বরী পাটনীর উক্তির অর্থের সঙ্গে চিত্ত সিংহের উপন্যাসের সমাপতন (Coincidence) প্রকটিত করে -

“পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার

ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের ফার।”<sup>৩০</sup>

উপন্যাসে দেখা যায় শেষমেষ নব বধুটি ইশারা ইঙ্গিতে পরিচয় দিলেন এবং পরিচয় এর মধ্যে স্বামী ও দেবতা মহাদেবের প্রসঙ্গ আছে। সতীনের জ্বালাও সহিতে হয় এবং বংশে কুলীন যা *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের সাথে অভিন্ন হয়ে যায় -

“গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত

পরম কুলীন স্বামী, বন্দ্যবংশখাত।”<sup>৩১</sup>

অন্নদামঙ্গল কাব্যের এই বক্তব্যের সঙ্গে ঈশ্বর পাটনী উপন্যাসের বক্তব্য যদি তুলে ধরা হয় তাহলে সহজেই বোঝা যাবে ঔপন্যাসিক দ্বিতীয় পর্বের অধ্যায়গুলিতে কতটা মিল রেখেছেন -

“তবে বংশের কথা যদি শুধাস, তবে কি, বাপ আমার মুখ্য বংশ, শ্বশুর বন্দ্য। পালটি ঘর।”<sup>৩২</sup>

সহজেই বোঝা যায় কতটা সাদৃশ্য। এছাড়া এই অধ্যায়ে বউ শাশুড়ির দ্বন্দ্ব, মেয়েদের স্বভাব চরিত্র, কুলীন বংশে বহুবিবাহ ও কোন্দলের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে -

“কুলীন ঘরের ওই এক দোষ মেয়ে। গন্ডা গন্ডা বে দেয়া। তা শুধু কুলীনদের বলি কেনে? কারো ঘরে কি আর নষ্টামীর কমতি আছে?”<sup>৩৩</sup>

এ যেন অন্নদামঙ্গল কাব্যের -

“পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল,  
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।”<sup>৩৪</sup>

এটি তাঁরই অনুসরণ। ঔপন্যাসিক পাটনীর মুখ দিয়ে নারীর স্বভাব চরিত্রের বিষয়ে বাণীই নিঃসরণ করেছেন -

“তোরা মেয়েরা, সব জিনিস বড় একলার করে চাস। তোদের আবার ভাগ সয় না।”<sup>৩৫</sup>

এই সংসার দুঃখময়, যে টিকে থাকবে সেই জীবন যুদ্ধে সফল। ঈশ্বরের একপাল ছেলেপুলে থাকা সত্ত্বেও অসহায় বাপের দুঃখের কাহিনী শোনার কোনো সঙ্গী ছিল না। সে একাকী কিন্তু এই অচেনা গৃহবধু তার ব্যথার প্রলেপ লাগানোর জন্য অগ্রদূত হয়ে এসেছে, যার মধ্যে ঈশ্বর নিজের মেয়ের রূপ খুঁজে পায়। তাই সে পিতা হয়ে বধুটির পালিয়ে যাওয়া যে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটতে পারে বা অদৃষ্টে খারাপ কিছু ঘটতে পারে তা ভেবে সে শঙ্কিত হয়ে তাকে ছলে বলে আটকাতে চায়। এখানেই ঈশ্বরের চরিত্রে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার দুজনের মধ্যে চলে মিথ্যা কথার চালাচালি। বধুটির তিন কুড়ি মাইল পথ হেঁটে এসেছে আবার ঈশ্বর সে যে রাজসিক খাবার খাওয়ার উদাহরণ দেয় তা পরবর্তীকালে বোঝা যায় সবই একে অপরের প্রতি নিছক মন ভুলানো কথা। ঈশ্বর ভালোবাসার কাঙাল, বধুটির হাতের স্পর্শে স্বর্গসুখ অনুভব করে মনে মনে ভাবে -

“মাগো তুই আমার হাত ধরেই আমাকে শেষে নিয়ে যা, আমি যে সে-পথ চিনি নে।”<sup>৩৬</sup>

এ যেন দুঃখ ও অসহায় জীবন থেকে মুক্তির বহিঃপ্রকাশ। মায়ের হাত ধরে ঈশ্বর মুক্তির পথ খুঁজতে চায়। দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে অভুলপ্রসাদ সেনের গানের সার্থক ব্যবহার এই উক্তি। এই সমস্ত উক্তির মধ্যে নিঃসন্দেহে পলাতক গৃহবধু ও ঈশ্বর যেন পিতা ও কন্যার সম্পর্কে আবদ্ধ। চিত্ত সিংহের ঈশ্বর পাটনী নিয়ে অনেক বেশি আধুনিক, সে বধু অর্থাৎ দেবীটির ওপর রীতিমতো পিতার মতো শাসন করে -

“এই ছুবি না আমাকে। দূর হ, দূর হ, আমার নাও থেকে।”<sup>৩৭</sup>

ঈশ্বর আবার বধুর কথায় মনভোলা হয়ে নাওয়ার দড়িটা খুলে দিতে বলে বধুকে।

নবম অধ্যায়, ‘মাঝ গাঙে দহ আছে’। এই অধ্যায় বধুটির নদী পারের জন্য ঈশ্বরকে যা চাই তাই দিতে চায় -

“যা চাইবি, তাই-ই দিব।”<sup>৩৮</sup>

বধুটির কারণেই ঈশ্বরের মায়ের স্মৃতি মনে পড়ে যায়। ফলস্বরূপ ঈশ্বরের মন ভালো হওয়ার কারণে সে পারানি না নিয়েই বধুটিকে নদী পার করে দিতে চায়। এভাবেই অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যেই তার মহত্বের উজ্জ্বলতা লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর যখন বধুটির পদযুগল নৌকাটাকে রাখতে দেখে তখন সাবধানে তার মঙ্গল কামনার জন্য বলে ওঠে -

“পা তুই নায়ের বাইরে থুয়েছিস? জানিস নে, এ-গাঙ্গে কামোট কুমির আছে।”<sup>৩৯</sup>

এ যেন অন্নদা মঙ্গলের -

“পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভালো হয়ে।  
পায়ে ধরি কি জানি কুস্তীরে যাবে লয়ে।”<sup>৪০</sup>

একজন মাঝি তার যাত্রীকে নিরাপত্তার পাশাপাশি পিতার মতো কর্তব্যপারায়ণতার বিষয়টি উত্থাপন করছেন। ঈশ্বরের কথায় বধুটি যখন আলতা রাঙা পা সঁউতির উপরে রাখে তখন সেই সঁউতিকে ঈশ্বর সোনার সঁউতি মনে করে এবং ভয়ে বলে ওঠে -

“এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।”<sup>81</sup>

দশম অধ্যায়, ‘মাগো! লোভের ছলনে ভুলি।’ এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের অসহায়, ক্ষুধার্ত ও হাহাকারের আত্মনাদ থেকে বাঁচার জন্য মনের অজান্তেই কল্পিত দেবীর কাছে ঐশ্বর্য চেয়ে বসে -

“স-সাগরা ধরিত্রী দে।

ধন জন অর্থ বিভূ সব সব-ই দে।”<sup>82</sup>

যদিও তার জন্য ঈশ্বর পরে নিজে থেকে অনুতপ্ত, কারণ সে জানে ধনসম্পদ কোনো কিছুই জগতে স্থায়ী নয় -

“ওই যে সোনারাজা টিবি, কেতুসেনার গড়, ওনাদের কি না ছিল? কিন্তুক এখন আছে কি? আছে এক তাল মাটির টিবি আর গড়ের পাথর।”<sup>83</sup>

দুঃখ দারিদ্র্য যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন জীবের সামাজিক প্রবৃত্তি অনুযায়ী মনের অজান্তেই কাঙ্ক্ষিত জিনিস সে চেয়ে বসে। কিন্তু পরে ঈশ্বর নিজের মতিভ্রম, মতিচ্ছন্ন বলে সেই অর্থের লোভ লালসা ও মোহের মধ্যে আচ্ছন্ন হতে চায় না, বরং সেখান থেকে সে বেরিয়ে আসতে চায়। ঈশ্বর জানে ধনী মানুষের যেমন চাওয়ার শেষ নেই তেমনি তাদের ঘরেও দুঃখেরও শেষ নেই। এটাও সে বেশ ভালোভাবেই জানে, দুঃখ অসহ্য হলে লোভ হয় আর লোভ হলে পাপ হয়, তাই ঈশ্বর পাপের বা অন্যান্যের পথে যেতে চায় না। সে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু ভিখারি নয়।

“মানুষের লোভ-ই মানুষের মরণ মা।”<sup>84</sup>

চরম দারিদ্রতার মধ্যে সে লোভের ছলনে ভুলতে চায় না।

একাদশ অধ্যায়, ‘যদি, মিলাইলে বিধি হে’। বিধি তুমি যদি আমাকে সেই দেখা দিলে তাহলে পরিত্রাণ দাও। এই অধ্যায়ে স্বপ্নের জগতে যে দেবীর সঙ্গে বাক-বিনিময় করছিল তখন তার হঠাৎ করে চৈতন্য ফিরলো বধুটির ধমকে। ঈশ্বর আসলে স্বপ্ন দেখছিল তা বোঝাই যায় -

“আশ্চর্য। এ কে? এ কি সে-ই?”<sup>85</sup>

ঈশ্বর পাটনী এভাবেই স্বপ্নে ভাবে, হয়তো একদিন কোনো দেবী এসে তার দুঃখের পরিত্রাণ দিয়ে সুখের সাগরে ভাসাবেন। কিন্তু আবার সে স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসে -

“সে কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিল?”

পরক্ষণেই লক্ষ্য করা যায় ঈশ্বর বধুটির কাছে পারানি কড়ি চাইছে কারণ ঈশ্বরের মনে হয়েছে বধুটি ভুজুঙ-ভাজুঙ মন্ত্র তন্ত্র দিয়ে তাকে বিপদে ফেলতে পারে। এই অধ্যায় দেবীর পাদস্পর্শে কাটের সঁউতি সোনা হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ আছে। সে বিপদে পড়ার ভয়ে সঁউতি জলে ফেলে দেয় এবং ক্রোধের সঙ্গে বলে যে আমাকে ভুজুঙ-ভাজুঙ দিয়ে চলবে না। নৌকা দৌড়াতে লাগলো এবং বধু ভয়ে বলে উঠলো -

“দিচ্ছি গো দিচ্ছি। তুই আগে দোলানি থামা।”<sup>86</sup>

বধুটি তার হাতের এক জোড়া চুড়ি খুলে পারানি হিসেবে দিতে গেলে ঈশ্বরের আবার চৈতন্য ফিরল। সে বাপ হয়ে মেয়ের কাছ থেকে চুরি নিতে চায় না, কিন্তু মেয়েটি নিস্তক্ক না ভাঙতে পেরে সে জলে ঝাঁপ দিতে চায় তখন মেয়েটি তার হাত ধরে ফেললে আবার ঈশ্বর পুনরায় পারানি চায়। একবার বিবেকের কবলে পড়ে পারানি নিতে দ্বিধা আবার পরক্ষণে পারানি চাওয়া এসবের মধ্যে ঈশ্বরের জীবনের দারিদ্রতার অভাব থেকে বাঁচার লক্ষণ যা তার জীবন সংগ্রামের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শেষমেষ বধুটির কাছ থেকে পারানি নেওয়ার জন্য অঞ্জলি বাড়িয়ে দেয় এবং তাকে দেবী কল্পনা করায় তার মস্তক বধুটির পায়ের কাছে নেমে আসে। বধুটি তখন গলুয়ের উপরে দাঁড়িয়ে। তারপর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের সেই অমোঘ বাণী ঈশ্বরের মুখে বিড়বিড় করে উচ্চারিত হতে শোনা যায়, যদি দিবি তাহলে দে -

“আমার সন্তান যেন থাকে দুখে ভাতে।”<sup>87</sup>

এই প্রার্থনার পর অনন্ত হয়ে দিক ফাটানো হা হা শব্দে দিগন্ত গ্রাস করে। এই অবস্থা দেখে বউটা কেঁদে ফেলে তখন সবে আলো ভাঙছে। সেই মুহূর্তে পাখি ডেকে উঠল। পাখির ডাকে ঈশ্বরের চৈতন্য ফিরল। পাখির ডাকে ঈশ্বরের চৈতন্য ফেরার মধ্যে এক ব্যঞ্জনা আছে যেটি ঈশ্বরের স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবের জগতের ফিরে আসাকে বোঝায়।

একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তার মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান। এগুলোর মধ্যে কোনোটার সামান্য খামতি থাকলে তাঁর স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা অন্তরায় হয়ে যায়। জীবনে বেঁচে থাকতে গেলে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও সমাজের মধ্যে তাঁকে নিয়ত জীবন সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। সমগ্র উপন্যাসের ১১টি অধ্যায়ে ঈশ্বর পাটনীর সেই অভাব, দারিদ্রতার চরম রূপ, জীবনবেদনা ও জীবন সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা আছে। তার থেকে সে মুক্তির উপায় খোঁজার চেষ্টা করে তাই নৌকায় বসে থাকা বধুটিকে সে নিজের অজান্তেই দেবী রূপে কল্পনা করতে থাকে। ঈশ্বরের বিশ্রামের সময় নেই, বাড়িতে শান্তি নেই, সারাদিন সে খেয়াঘাটে পড়ে থাকে। অভাবে দক্ষ হয়ে ছেলেমেয়েদের গুপ্তিসুদ্ধ মরার কথাও তাকে বলতে বাধ্য হতে হয়েছে। তার স্ত্রী, সন্তান থেকেও সে নিঃস্ব। একজন মানুষের জীবনে এর থেকে ট্রাজেডি আর কি হতে পারে? ঈশ্বর পাটনী উপন্যাসের মধ্যেই ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী আর চিত্ত সিংহের ঈশ্বর পাটনীর চরিত্রের মধ্যে জগতের অসহায়, বধিত, অভাব-পীড়িত মানুষদের জীবনবেদনা ও জীবন সংগ্রামের করুণ আখ্যানের সার্থক রূপায়ণ এই উপন্যাস। ঈশ্বর পাটনী উপন্যাস সৃষ্টি প্রসঙ্গে সাহিত্যিক চিত্ত সিংহ স্বীকার করেছেন যে, তিনি ভারতচন্দ্রের কাছে ‘ঋণী’। তা সত্ত্বেও *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযোজন, বর্জন ও পরিমার্জনের মধ্যে দিয়ে তিনি যে নবনির্মিত আখ্যান বা চরিত্রের পুনর্নির্মাণ করেছেন তা বক্ষ্যমাণ নিবন্ধটি সম্পূর্ণ পাঠ করলে পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে না। তবে ভারতচন্দ্রের ‘ঈশ্বরী পাটনী’ চরিত্র হোক আর চিত্ত সিংহের ‘ঈশ্বর পাটনী’ চরিত্র হোক, উভয় আখ্যানকার তাঁরা যে সুনিপুণ ভাবে চরিত্রটিকে দরিদ্র বাঙালির খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে অঙ্কন করে জাতীয় চরিত্র রূপায়ন করতে চেয়েছিলেন তা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশংসনীয়।

## Reference:

১. রায়, শ্রী ভারতচন্দ্র, ‘অন্নদামঙ্গল’, ২য় সং, ১৭১৭ শক, কৃষ্ণনগরের রাজবাটির মূলপুস্তক দৃষ্টে, কলিকাতা, পৃ. ১৮৬
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭
৩. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, ‘কবি ভারতচন্দ্র’, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৭, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা, পৃ. ৬৮
৪. সিংহ, চিত্ত, ‘ঈশ্বর পাটনী’, প্রথম মুদ্রণ, অক্টোবর ১৯৭৬, সৃজনী, কলিকাতা
৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭
৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘গীতবিতান (অখণ্ড), পুনর্মুদ্রণ, বৈশাক ১৪০০, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ. ১৬৪
৮. সিংহ, চিত্ত, ‘ঈশ্বর পাটনী’, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
৯. দাস, অরুণকুমার, ‘ব্যক্তিগত মতবিনিময়ে’, ২০২৫, কলিকাতা
১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১
১১. পূর্বোক্ত
১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
১৩. পূর্বোক্ত
১৪. পূর্বোক্ত
১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯
১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪
২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
২৪. পূর্বোক্ত
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২
২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
২৭. সিংহ, চিত্ত, 'ঈশ্বর পাটনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬
২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১
২৯. পূর্বোক্ত
৩০. রায়, শ্রীভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', পৃ. ১৮৪
৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫
৩২. সিংহ, চিত্ত, 'ঈশ্বর পাটনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩
৩৪. রায়, শ্রীভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', পৃ. ১৮৫
৩৫. সিংহ, চিত্ত, 'ঈশ্বর পাটনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯
৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২
৪০. রায়, শ্রীভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', পৃ. ১৮৫
৪১. সিংহ, চিত্ত, 'ঈশ্বর পাটনী', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০